ARYA CHARITA

OR

LIVES OF THE ANCIENT HINDUS

BY

BIRESHWARA PANDA.

SECOND EDITION.

আৰ্য্যচরিত।

প্রথম ভাগ।

বাল্মীকি, ব্যাস, কালিদাস, শাক্যসিংহ, শঙ্করাচার্য্য
ও বিজয় সিংহের সংক্ষিপ্ত জীবন বৃত্তান্ত।

শ্রীবীরেশ্বর পাঁড়ে

প্রণীত।

দ্বিতীয় সংস্করণ।

CALCUTTA.

The New Sanskrit Press.

1876.

Printed by Gopal Chunder Day.
At the New Sanskrit Press.
14 Goabagan Street CALCUTTA.
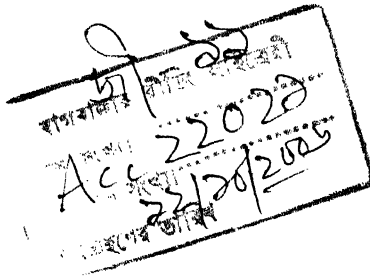
বিজ্ঞাপন।

প্রাচীন আর্য্যগণের জীবনবৃত্তান্ত অবগত হওয়া যায় এমন কোন গ্রন্থ বঙ্গভাষায় দৃষ্ট হয় না। তজ্জন্যই বঙ্গভাষার ও বাঙ্গালী জাতির এত দুর্গতি। অষ্টম বর্ষীয় একজন বালক ডুবাল, সিমসন প্রভৃতির জীবনবৃত্তান্ত অনর্গল বলিতে পারে, কিন্তু বিংশবর্ষীয় যুবকও বাল্মীকি প্রভৃতি ভারতবর্ষীয় প্রাচীন মহাত্মাগণের নাম পর্য্যন্তও জানে কিনা সন্দেহ। দেখা গিয়াছে অনেকে যুধিষ্ঠির, দুর্য্যোধন প্রভৃতির বিষয়ও কিছুমাত্র অবগত নহে। ইহা অল্প আপেক্ষের বিষয় নহে। জীবন চরিত থাকিলে কখনই এরূপ ঘটিত না। অতএব একখানি জীবন-চরিত নিতান্ত আবশ্যক হইয়াছে। কিন্তু তাহা সংকলন করা মাদৃশ ব্যক্তির পক্ষে বড় সহজ নহে। এজন্য বালকদিগের পাঠোপযোগী কয়েকজন প্রাচীন মহাত্মার জীবনের স্থূল স্থূল বিবরণ সংকলিত করিয়া আর্য্যচরিত প্রথমভাগ নামে এই ক্ষুদ্র গ্রন্থ খানি প্রকাশিত হইল। ডুবাল প্রভৃতির জীবনচরিত পাঠে যে উপকার হয় ইহাদ্বারা তাহা হইবে কিনা বলিতে পারি না, এইমাত্র বলাযায় যে, ইহাদ্বারা বালকগণ স্বদেশীয় প্রাচীন মহাত্মা-গণের বিষয় কিছু কিছু জানিতে পারিবে দুরূহ কোন

বিষয়ই ইহাতে বর্ণিত হয় নাই। কাল নির্ণয় করিতে গেলে অনেক কূট তর্কের অবতারণা করিতে হয়, বালকদিগের পক্ষে তাহা নিতান্ত কঠিন হইয়া উঠে, এজন্য তদ্বিষয়ে কোন কথা বলা হয় নাই; যে মতটী সাধারণে প্রচলিত তাহাকেই গ্রহণ করা হইয়াছে। সুতরাং স্থানে স্থানে নবপ্রচারিত মতের সহিত অনৈক্য হইয়াছে।

আর্য্যচরিত প্রথমভাগে কবিকুলগুরু বাল্মীকি, কৃষ্ণ-দ্বৈপায়ন বেদব্যাস, মহাকবি কালিদাস, বুদ্ধ শাক্যসিংহ, শঙ্করাচার্য্য, কুমার বিজয় সিংহ এই ছয়জনের সংক্ষিপ্ত জীবনী সংগৃহীত হইল। এই সামান্য পুস্তক সাধারণে আদরণীয় হইবে কি না সন্দেহে এখানি এত ক্ষুদ্র আকারে প্রকাশিত হইল। যদি উৎসাহ পাই দ্বিতীয় বারে ইহার কলেবর বৃদ্ধি, এবং দ্বিতীয়, তৃতীয় প্রভৃতি খণ্ডে আর্য্য-মহাত্মাগণের জীবনচরিত ক্রমশঃ প্রকাশিত হইবে।

গ্রন্থখানি অত্যন্ত ব্যস্ততার সহিত লিখিত হইয়াছে, এজন্য ইহাতে অনেক দোষ থাকার সম্ভব। সহৃদয় ব্যক্তিগণ অনুগ্রহ করিয়া সে সকল ক্ষমা করিবেন।

১২৮১। ২৭ অগ্রহায়ণ।

শ্রীবীরেশ্বর পাঁড়ে

কায়বা।

আর্য্যচরিত।

প্রথম ভাগ।

কবিগুরু বাল্মীকি।

চারি সহস্র বৎসরেরও অধিক কাল গত হইল, কবিগুরু বাল্মীকি ভারতবর্ষে জন্ম গ্রহণ করেন। মহর্ষি চ্যবন তাঁহার জনক। তিনি ভারতবর্ষের কোন্ স্থানে জন্ম গ্রহণ করেন, তাহার স্থিরতা নাই। বাল্মীকির প্রকৃত নাম রত্নাকর। বিশুদ্ধ ব্রাহ্মণ বংশে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু অনেক বয়স পর্য্যন্ত তাঁহার চরিত্র নিতান্ত দূষিত ছিল। তিনি এক নীচজাতীয়া রমণীর পানিগ্রহণ করিয়া গৃহ পরিত্যাগ করেন ও তাহার সহবাসে সতত অসৎ কার্য্যে রত থাকিতেন; সর্ব্বদা ধনুর্ব্বাণ হস্তে লইয়া বনে বনে ভ্রমণ করিতেন এবং সুযোগ পাইলে পথিকদিগের যথা সর্ব্বস্ব অপহরণ করিয়া লইতেন। এই পাপ-বৃত্তি তাঁহার জীবনোপায় ছিল।

একদা রত্নাকর দূর হইতে কতিপয় তপস্বীকে কানন পথে গমন করিতে দেখিয়া নিজ কুপ্রবৃত্তি সাধন মানসে বেগে তাঁহাদিগের অনুবর্ত্তী হইলেন এবং চীৎকার করিয়া

কহিলেন ‘তোমরা কোথায় যাইতেছ? দাঁড়াও, আর যাইতে হইবে না।’ ঋষিগণ রত্নাকরের তথাবিধ ভয়ানক মূর্ত্তি দর্শন ও মর্ম্মভেদী ভৈরব স্বর শ্রবণ করিয়া নিতান্ত ভীত হইলেন, কিন্তু উপায়ান্তর না দেখিয়া বিনীতভাবে কহিলেন, ‘ভদ্র! তোমাকে উপবীতধারী দেখিতেছি, তুমি কি ব্রাহ্মণ তনয়? তবে তুমি কি নিমিত্ত ঈদৃশ ভয়ানক বেশে আগমন করিয়া কঠোরস্বরে আমাদিগকে আহ্বান করিতেছ? কোন কুঅভিপ্রায় তোমার হৃদয়ে স্থান পাইয়াছে, এমত সম্ভব বোধ হয় না।’ রত্নাকর কহিলেন— ‘আমি ব্রাহ্মণ তনয় সত্য, কিন্তু স্ত্রীপুত্র প্রভৃতি অনেক পরিবারে বেষ্টিত। তাহাদিগের ভরণ পোষণের নিমিত্ত ধনুর্ব্বাণ হস্তে প্রতিদিন বনে বনে ভ্রমণ করি, পথিক দেখিলেই তাহার সর্ব্বস্ব কাড়িয়া লই। অদ্য আমার সৌভাগ্যবশতঃ তোমরা এই পথে আগমন করিয়াছ। অতএব তোমাদের নিকট যাহা কিছু আছে, অবিলম্বে প্রদান কর নতুবা এই ক্ষণেই আমার বিক্রম দেখিতে পাইবে।’ ঋষিগণ উপায়ান্তর না দেখিতে পাইয়া কহিলেন—‘তোমার প্রস্তাব মত আমাদিগের সমুদায় তোমাকে প্রদান করিতে স্বীকৃত আছি; কিন্তু তোমাকে একটী কথার উত্তর দিতে হইবে। তুমি ব্রাহ্মণ তনয় হইয়া কি জন্য এই ঘোর অধর্ম্মাচরণ করিতেছ? তুমি যাহাদিগের জন্য এই নিতান্ত ঘৃণাকর পাপকার্য্যের অনুষ্ঠান করিতেছ, তাহারা কি এই পাপ কার্য্যের অংশ গ্রহণ করিবে? পরকালে তাহারা কি কিয়দংশ গ্রহণ করিয়া তোমার নরক যন্ত্রণার লাঘব করিবে?

তুমি যাইয়া তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা কর। যদি তাহারা তোমার পাপের অংশ গ্রহণে সম্মত হয়, তবে তৎক্ষণাৎ আমাদিগের যাহা আছে, সমুদায় তোমাকে প্রদান করিব, বল প্রকাশ করিতে হইবে না। তোমার প্রত্যাগমন পর্য্যন্ত আমরা এই স্থানে থাকিব, কোথায়ও যাইব না। যদি বিশ্বাস না হয় আমাদিগকে বাঁধিয়া রাখিয়া যাও।' ঋষিগণের বাক্য শ্রবণ করিয়া রত্নাকরের মনে চিন্তার উদয় হইল এবং তিনি যে পাপকর্ম্ম করিতেছেন, তাহা কিছু বুঝিতে পারিলেন। তখন পরিবারবর্গের মনোগত ভাব জানিবার জন্য গৃহে গমন করিলেন।

গৃহে যাইয়া স্ত্রী ও পুত্রগণকে ডাকিয়া কহিলেন—'তোমাদিগকে আমি একটী কথা জিজ্ঞাসা করি, তাহার প্রকৃত উত্তর দাও, কদাচ মিথ্যা বলিও না।' তাহারা তাহা স্বীকার করিলে, রত্নাকর কহিলেন,—'আমি নিত্য বনে বনে ভ্রমণ করিয়া অনেক মনুষ্যের যথাসর্ব্বস্ব বল পূর্ব্বক গ্রহণ করি; তাহাতে অনেক সময় অনেকের প্রাণ বিনাশ পর্য্যন্তও করিতে হয়; এই প্রকারে আমি যে অর্থ আহরণ করি, তাহা আমি একাকী উপভোগ করি না, তোমাদিগকে অংশ দিয়া থাকি। অধিক কি কেবল তোমাদিগের সুখ সম্পাদনের নিমিত্ত আমাকে এই পাপ বৃত্তি অবলম্বন করিতে হইয়াছে। এক্ষণে জিজ্ঞাসা করি, এই সকল পাপ কর্ম্মের ফল আমি কি একাকী ভোগ করিব? না তোমরা ইহার অংশ গ্রহণ করিবে?' রত্নাকরের এই সকল বাক্য শ্রবণ করিয়া তাহারা

কহিল,—'আমরা তোমার পোষ্য; আমাদিগকে প্রতিপালন করা তোমার অবশ্য কর্ত্তব্য; কেন না যখন বিবাহ করিয়াছ, তখনই স্ত্রীকে ভরণ পোষণ করিবে প্রতিজ্ঞা করিয়াছ। যখন সন্তানের জন্ম দান করিয়াছ, তখনই তাহার রক্ষণাবেক্ষণ করিতে বাধ্য হইয়াছ। বিশেষতঃ যখন স্ত্রীপুত্র হইতে তুমি সুখ ভোগ কর, তখন তাহাদিগের ভৃতিস্বরূপ অন্ন বস্ত্রাদি তোমাকে দিতেই হইবে। তজ্জন্য তুমি পাপ কর কি পুণ্য কর, তুমিই তাহার অবশ্য ফল ভোগ করিবে, আমরা তাহার অংশ কি জন্য গ্রহণ করিব? তবে তোমার স্ত্রী বা পুত্র বলিয়া লোক সমাজে আমরা ঘৃণিত বা পূজিত হইতে পারি। তাহাতে তোমার পাপের বৃদ্ধি ভিন্ন হ্রাস হয় না।' এই সকল কথা শুনিয়া রত্নাকরের মনে বৈরাগ্যের উদয় হইল, তখন বুঝিলেন যে তিনি কি ভয়ানক পাপাচারী।

রত্নাকর অবিলম্বে গৃহ পরিত্যাগ করিয়া দ্রুতপদে ঋষিগণ সন্নিধানে উপস্থিত হইলেন এবং ধনুর্ব্বাণ দূরে নিক্ষেপ করিয়া তাহাদিগের চরণে দণ্ডবৎ পতিত হইয়া গলদশ্রু লোচনে করুণ বচনে কহিলেন 'হে পরম দয়াবান্ মহর্ষিগণ! আমি নিতান্ত নারকী, আমার তুল্য দুষ্কর্ম্মশালী বোধ হয় জগতে আর নাই। আজি আপনাদিগের প্রভাবে বুঝিতে পারিলাম, এ তাবৎ কাল আমি কেবল দুষ্কর্ম্মে যাপন করিয়াছি। এক্ষণে দয়া করিয়া আমার পরিত্রাণের উপায় বিধান করুন। সাধুসমাগমের ফল প্রত্যক্ষ হউক। এক্ষণে যাহাতে আমি দুস্তর নরক হইতে পরিত্রাণ পাই, তাহার উপায়

বিধান করুন। আপনারা ভিন্ন আমার গত্যন্তরই নাই।' ঋষিগণ রত্নাকরের এবম্বিধ কাতরোক্তি শ্রবণ করিয়া পরস্পর কহিলেন, 'যদিও এই দুর্বৃত্ত সাধুগণের উপেক্ষ্য কিন্তু যখন শরণাগত হইয়াছে, তখন সদুপদেশ প্রদান করিয়া ইহাকে উদ্ধার করা কর্ত্তব্য।' এই বলিয়া রত্নাকরকে কহিলেন, 'অগ্রে তোমার মনের একাগ্রতা সম্পাদন করা আবশ্যক, পরে তোমাকে উপদেশ প্রদান করিব। অতএব কিছু দিন অনন্যমনে রাম নাম জপ করিয়া মনের একাগ্রতা সম্পাদন কর।' রত্নাকর 'রাম' বলিতে গিয়া 'আম' বলিয়া ফেলিলেন। তাঁহার জিহ্বা এমনই জড় হইয়া গিয়াছিল যে, কিছুতেই 'রাম' শব্দ উচ্চারণ করিতে পারিলেন না। তখন ঋষিগণ শব্দটী উল্টাইয়া অর্থাৎ 'মরা' 'মরা' এই প্রকারে শিক্ষা দিয়া রাম শব্দ উচ্চারণ করিতে শিখাইলেন। ঐ শব্দ উচ্চারণ করিতে পারিলেন না বলিয়া রত্নাকরের মনে আরও ঘৃণার উদয় হইল। তখন তিনি আহার নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া অনন্য মনে রাম নাম জপ ও তৎসঙ্গে ইন্দ্রিয় সংযম করিতে লাগিলেন। তিনি এমনই অনন্যমনে তপঃ করিতেন যে তাঁহার শরীর জড় পদার্থবৎ নিশ্চল থাকিত। নিকটস্থ পুত্তিকা সকল জড় পদার্থ ভ্রমে তাঁহার শরীরে বল্মীক নির্ম্মাণ করিয়াছিল, তিনি তাহার কিছুই জানিতে পারেন নাই।

এইরূপে কিছু দিন গত হইলে ঋষিগণ রত্নাকরকে উপদেশ দিবার নিমিত্ত তথায় উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, রত্নাকর একাগ্রচিত্তে জপে নিমগ্ন রহিয়াছেন ও তাঁহার

শরীরে বল্মীক নির্ম্মিত হইয়াছে। এই অদ্ভুত ব্যাপার দেখিয়া তাঁহারা অত্যন্ত চমৎকৃত হইলেন ও তাঁহার ভূরি ভূরি প্রশংসা করিতে লাগিলেন। তখন তাঁহারা তাঁহাকে যথাশাস্ত্র উপদেশ প্রদান করিয়া কহিলেন "রত্নাকর! তপঃকালে তোমার শরীর বল্মীকে আচ্ছন্ন হইয়াছিল, অতএব অদ্যাবধি তোমার নাম 'বাল্মীকি' হইল"। সেই দিন অবধি তিনি দস্যু রত্নাকর নাম ত্যাগ করিয়া মহর্ষি বাল্মীকি নামে বিখ্যাত হইলেন, এবং প্রত্যহ সাতিশয় যত্ন সহকারে বিদ্যাশিক্ষা ও নানা প্রকারে আপনার উন্নতি সম্পাদন করিতে লাগিলেন। ক্রমে চারিদিক হইতে বহু সংখ্যক শিষ্য আসিয়া তাঁহার নিকট অধ্যয়ন করিতে লাগিল।

একদা বাল্মীকি শিষ্যগণ সমভিব্যাহারে তমসানদীর তীরে উপস্থিত হইলেন। তথায় নদীর অবতরণ প্রদেশ কর্দ্দম শূন্য দেখিয়া অবগাহন মানসে শিষ্যের নিকট হইতে বল্কল গ্রহণ করিয়া তীরবর্ত্তী নিবিড় অরণ্য নিরীক্ষণ করত ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। সেই বনে এক ক্রৌঞ্চ-মিথুন মধুর স্বরে গান করতঃ বিহার করিতেছিল। এই সময়ে এক ব্যাধ আসিয়া তন্মধ্য হইতে ক্রৌঞ্চকে বিনাশ করিল। ক্রৌঞ্চী ক্রৌঞ্চকে নিহত ও শোণিত--লিপ্ত-কলেবরে ধরাতলে বিলুণ্ঠিত দেখিয়া কাতরস্বরে রোদন করিতে লাগিল। ধর্ম্ম-পরায়ণ মহর্ষি বাল্মীকি ক্রৌঞ্চকে নিষাদ কর্ত্তৃক নিহত দেখিয়া বিষাদ সাগরে মগ্ন হইলেন। ক্রৌঞ্চীর করুণ কণ্ঠস্বরে তাঁহার অন্তর বিদীর্ণ হইল। তখন

তিনি এই কার্য্য নিতান্ত অধর্ম্মজনক জ্ঞান করিয়া কহিলেন ;—

"মা নিষাদ ! প্রতিষ্ঠাং ত্বমগমঃশাশ্বতীঃ সমাঃ।
যৎক্রৌঞ্চমিথুনাদেকমবধীঃ কামমোহিতম্ ।"

অর্থাৎ "রে নিষাদ ! তুই ক্রৌঞ্চমিথুন হইতে কামমোহিত ক্রৌঞ্চকে বিনাশ করিয়াছিস, অতএব তুই চিরকাল প্রতিষ্ঠাভাজন হইতে পারিবি না।"

যে রত্নাকর বনে বনে ভ্রমণ করিয়া অহরহ মনুষ্যজীবন নষ্ট করিতেন, আজি সেই রত্নাকর একটী পক্ষীর মৃত্যুতে কত দুঃখিত হইয়াছেন ও তাহার হন্তা ব্যাধকে কতই নিন্দা করিতেছেন। জ্ঞানের কি আশ্চর্য্য মহিমা ! যখন জ্ঞান ছিল না, তখন ইনি নরঘাতক দস্যু রত্নাকর ছিলেন, এক্ষণে জ্ঞান লাভ করিয়া ধর্ম্মপরায়ণ, করুণহৃদয়, মহর্ষি বাল্মীকি হইয়াছেন। সামান্য পক্ষীর রোদনে এখন ইহাঁর হৃদয় দ্রব হয়। অতএব যিনি জ্ঞান সম্পন্ন তিনিই মনুষ্য। নরদেহ বিশিষ্ট হইলেই মনুষ্য হয় না।

বাল্মীকি নিষাদকে এইরূপ অভিশাপ দিয়া মনে মনে কহিতে লাগিলেন, 'আমি এই শকুনির শোকে আকুল হইয়া কি বলিলাম।' অনন্তর প্রধান শিষ্য ভরদ্বাজকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, 'বৎস ! আমার এই বাক্য চরণ-বদ্ধ, অক্ষর-বৈষম্য-বিরহিত ও তন্ত্রীলয়ে গান করিবার সম্যক উপযুক্ত হইয়াছে। অতএব ইহা যখন আমার শোকাবেগ প্রভাবে কণ্ঠ হইতে নির্গত হইল, তখন ইহা

নিশ্চয়ই শ্লোক রূপে প্রথিত হউক।' তদবধি চরণ বদ্ধ বাক্য অর্থাৎ পদাময় রচনা সকল শ্লোক নামে অভিহিত হইল। মহর্ষি বাল্মীকি কেবল উপরি উক্ত কবিতাটী মাত্র রচনা করেন নাই, তিনি রামায়ণ নামে একখানি মহাকাব্য প্রণয়ন করেন। মহর্ষি তাহাতে সমগ্র রামচরিত আশ্চর্য্য রূপে বর্ণন করিয়াছেন।

বাল্মীকি প্রথম কবি—'মা নিষাদ' কবিতা প্রথম কবিতা এবং রামায়ণ প্রথম কাব্য। উহা কেবল ভারতবর্ষের কেন, বোধ হয় সমগ্র পৃথিবীর প্রথম কাব্য।* এই জন্যই বাল্মীকির কবিকুল গুরু নাম হইয়াছে। অতএব সকলেরই উচিত যে ঐ শ্লোকটী অভ্যাস করিয়া রাখেন। আদি শ্লোক বলিয়া পরিচয় দিতে জগতে আর নাই।

---

* ভারতবর্ষ যে পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্ব প্রাচীন এবং তথায় সভ্যতা ও বিদ্যার চর্চ্চা যে সর্ব্বাগ্রে হইয়াছিল, তাহা এক্ষণে এক প্রকার সিদ্ধান্ত হইয়া গিয়াছে। সুতরাং ভারতবর্ষের যিনি আদি কবি, তিনিই পৃথিবীর আদি কবি। বিশেষত: অপর দেশ সকলের মধ্যে হোমরের তুল্য প্রাচীন কবি আর কাহাকেও দেখিতে পাওয়া যায় না। সেই হোমর প্রণীত কাব্যের সহিত বাল্মীকি প্রণীত রামায়ণের বিবরণগত এত ঐক্য দৃষ্ট হয় যে অনেকেই বিবেচনা করেন যে উহার একখানি দৃষ্টে অপর খানি প্রণীত, তাহা হইলে গ্রীক কবিকেই ভারতীয় কবির অনুকারক বলিতে হয়। বাল্মীকি যে ভারতবর্ষের মধ্যেও আদিকবি, তাহা উপরোক্ত বিবরণে স্পষ্ট প্রকাশ হইতেছে। বিশেষ বেদ ছাড়িয়া দিলে মনু প্রণীত স্মৃতি ভারতবর্ষের প্রথম গ্রন্থ বলিয়া একরূপ স্থির হইয়াছে; কিন্তু রামায়ণ মনুসংহিতার পূর্ব্বকার গ্রন্থ; তাহা

জন প্রবাদ এই যে, বাল্মীকি রাম জন্মিবার আশি হাজার বৎসর পূর্ব্বে রামায়ণ রচনা করেন। একথা যেমন অসম্ভব, তেমনই অপ্রামাণিক। * রামায়ণে ইহা নাই বরং স্পষ্টই লিখিত আছে যে, "রঘুকুলতিলক রাম রাজ্য লাভ করিলে মহর্ষি বাল্মীকি বিচিত্র পদ ও অর্থ সংযুক্ত রামচরিত সংক্রান্ত এক মহাকাব্য রচনা করিলেন।"† ইহাতে স্পষ্টই দেখা যাইতেছে যে, রাম লঙ্কা

রামায়ণ ও মনুসংহিতা পাঠ করিলে বুঝা যায়। রামায়ণে লিখিত আছে, রামের বিবাহ প্রাতঃকালে ও বিবাহাঙ্গ নান্দি-শ্রাদ্ধ পূর্ব্বদিনে সম্পন্ন হয়; একাদশ দিনে রাম প্রভৃতির নাম-করণ ও দশরথের শ্রাদ্ধ সম্পন্ন হয় এবং যজ্ঞীয় পশু অপহৃত হওয়ায় অযোধ্যাধিপতি অম্বরীষ শুনঃশেপ নামক ব্রাহ্মণ তনয়কে বলি প্রদান করেন। এ সমুদায়ই মন্বাদি প্রণীত শাস্ত্রের বিরুদ্ধ। তাহাতে ব্রহ্ম-হত্যা মহাপাপ, ক্ষত্রিয়ের দ্বাদশ দিবস অশৌচ, বিবাহ কাল রাত্রি এবং নান্দিশ্রাদ্ধ বিবাহ দিনের প্রাতঃ কৃত্য বলিয়া স্পষ্ট বিধি আছে। যদি বাল্মীকির সময়ে ঐ সকল শাস্ত্র থাকিত তাহা হইলে তিনি কখন এরূপ শাস্ত্র বিরুদ্ধ ব্যবহার প্রধান রাজবংশে প্রচলিত থাকার কথা লিখিতেন না। সুতরাং বাল্মীকি যে ইহাঁদিগের অপেক্ষা প্রাচীন তাহাতে আর সংশয় থাকিতেছে না। অতএব বাল্মীকি যে সমগ্র পৃথিবীর কবিগুরু তাহাতে আর সংশয় কি?

* বাল্মীকি রামায়ণের প্রথম হইতে চতুর্থ সর্গ পর্য্যন্ত মনো-যোগ সহ পাঠ করিলে অর্থাৎ ক্রিয়া পদগুলির প্রতি মনঃ সংযোগ করিলে স্পষ্ট বুঝা যাইবে যে, রাম ও বাল্মীকি সম-সাময়িক।

† চতুর্থ সর্গের প্রথম।

যুদ্ধে জয়ী হইয়া, অযোধ্যার রাজা হইলে মহর্ষি রামায়ণ রচনা করেন। প্রথমে রাবণ বধ পর্য্যন্ত ছয় কাণ্ড প্রণয়ন করিয়া রামতনয় লব ও কুশকে অধ্যয়ন করান, পরে উত্তর কাণ্ড প্রণয়ন করেন। * লব কুশ বাল্মীকির আশ্রমে প্রতি-পালিত হইয়াছিলেন। তাঁহারা যেরূপ পরম রূপবান, সেইরূপ সুকণ্ঠ ছিলেন। বাল্মীকি নিজ গ্রন্থ প্রচার করিবার অভিপ্রায়ে তাহা তাঁহাদিগকে শিক্ষা দেন। তাঁহারা অতি অল্প দিনে সমগ্র রামায়ণ কণ্ঠস্থ করিয়া ব্রাহ্মণ সমাজে মনোহর স্বরে গান করিতে আরম্ভ করি-লেন। একে বাল্মীকির রচনা অতি মধুর, তাহাতে সম-ধিক রূপবান্ কলকণ্ঠ শিশুদ্বয় গান করাতে তাহা এমনই চমৎকার হইয়াছিল যে, বোধ হয় পৃথিবীতে কখন তাহার তুল্য সুমধুর কেহ শুনে নাই। অতি অল্প দিনেই সর্ব্বত্র বাল্মীকির রচনা পারিপাট্য ও শিশুদ্বয়ের সঙ্গীত নিপুণতার যশঃ সৌরভ বিস্তৃত হইল। যেখানে তাঁহারা গান করি-

---

* চতুর্থ সর্গের দ্বিতীয় শ্লোকে লিখিত আছে "এই কাব্য মধ্যে চতুর্বিংশতি সহস্র শ্লোক পাঁচ শত সর্গ ও ছয় কাণ্ড ও উত্তরকাণ্ড প্রস্তুত আছে।" উত্তর কাণ্ডের নাম পৃথক করিয়া বলায় উহা যে শেষে হইয়াছিল, তাহা বুঝা যাইতেছে এবং চতুর্থ সর্গের সপ্তম শ্লোকে বাল্মীকি কৃত গ্রন্থের "পৌলস্ত্যবধ" নাম প্রদত্ত হইয়াছে। ছয়কাণ্ডে রাবণবধ শেষ হয়, এই জন্য উহার পৌলস্ত্য বধ নাম হইয়াছে। বিশেষ উত্তরকাণ্ডে রামের মৃত্যু পর্য্যন্ত বর্ণিত হইয়াছে অথচ রাম লব কুশের নিকট রামায়ণ শ্রবণ করিয়াছিলেন। লব কুশ পৌলস্ত্য বধ পর্য্যন্ত রামকে শুনাইয়াছিলেন।

তেন, তথায় এত শ্রোতা আগমন করিত যে, কিছুতেই সকলের স্থান হইত না। ক্রমে রাম এই সম্বাদ পাইয়া লব ও কুশকে নিকটে আনয়ন করত তাঁহাদিগের প্রমুখাৎ স্বচরিত আদ্যোপান্ত শ্রবণ করিলেন।

বাল্মীকি কেবল আদি কবি নহেন, তিনি একজন মহাকবি। তাঁহার রচনা অতি মধুর, সরল ও হৃদয়-গ্রাহী। উৎকৃষ্ট কল্পনা শক্তিতে তিনি ভারতের সকল কবি হইতে শ্রেষ্ঠ। তাঁহার স্বভাব বর্ণনাও অতি চমৎ-কার। ফল রামায়ণ অতি উৎকৃষ্ট গ্রন্থ। যদি অত্যুক্তি দোষে দূষিত না হইত, তাহা হইলে রামায়ণ পৃথিবীর সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ কাব্য হইত। একজন পণ্ডিত বলিয়াছেন যে, যাহা একবার বাল্মীকি কর্ত্তৃক বর্ণিত হইয়াছে, পৃথিবীর কোন কবি তাহা পুনঃ বর্ণন করিয়া প্রশংসা ভাজন হইতে পারেন না। তিনি স্থানান্তরে বলিয়াছেন, "মোটের উপর দেখিতে গেলে বলিতে হইবে যে রামায়ণ ও মহা-ভারতের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কাব্য পৃথিবীতে বুঝি আর নাই।" ফল কবিতার প্রথম প্রদর্শক হইয়া তিনি যেরূপ কাব্য লিখিয়াছেন অনেক মহাকবি উত্তমরূপে শিক্ষিত হইয়াও তাহা পারেন নাই।

বাল্মীকি জ্যোতিষ, ভূগোল ও তৎসময়ের বিজ্ঞান শাস্ত্রে পারদর্শী ছিলেন। তিনি রামায়ণে যেরূপ স্থান নির্দ্দেশ করিয়াছেন, ভূগোল বিদ্যায় বিশেষ অধিকার না থাকিলে তাহা কখনই হইতে পারে না।

[১২]

বেদব্যাস।

প্রায় সাড়ে তিন সহস্র বৎসরেরও অধিক হইল ধীবর-পালিতা কন্যা সত্যবতীর গর্ভে যমুনা-মধ্যস্থ একটী দ্বীপে বেদব্যাস জন্ম গ্রহণ করেন। স্বনাম খ্যাত সংহিতা প্রণেতা সুপ্রসিদ্ধ মহর্ষি পরাশর তাঁহার পিতা। সত্যবতীর কন্যাকাবস্থায় ব্যাসের জন্ম হয়, এজন্য সত্যবতী প্রসব মাত্রেই তাঁহাকে পরিত্যাগ করেন। পরে মহারাজ শান্তনুর সহিত সত্যবতীর বিবাহ হয়। ঐ শান্তনুর প্রপৌত্র মহাভারতের নায়ক প্রসিদ্ধ যুধিষ্ঠির ও দুর্যোধন আদি।

ব্যাস মাতৃকর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইলে পরাশর তাঁহাকে লইয়া প্রতিপালন করেন। অতি শৈশবকাল হইতে বিদ্যাভাসে দৃঢ় মনঃসংযোগ করাতে তিনি সর্ব্ব শাস্ত্রে সুপণ্ডিত হইয়াছিলেন। ব্যাসের বর্ণ কৃষ্ণ ছিল, এজন্য তাঁহার একটী নাম কৃষ্ণ, দ্বীপে জন্ম গ্রহণ করেন এজন্য আর একটী নাম দ্বৈপায়ন এবং বেদ বিভাগ করেন এজন্য উনি মহর্ষি 'কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন বেদব্যাস' নামে অভিহিত হয়েন। বেদব্যাসের অধ্যবসায় অতি চমৎকার ছিল। তিনি বেদ বিভাগ, পুরাণ সংগ্রহ, মহাভারত ও বেদান্ত দর্শন প্রণয়ন করেন। এই চারিটী কার্য্য অতি দুরূহ ও বহুকাল সাধ্য। ইহার একটি কাজ করিলে জগতে বিখ্যাত হওয়া যায়।

তিনি অতি দ্রুত রচনা করিতে পারিতেন। কেহ

লিখিতে পারিলে তাঁহার রচনার ক্ষণমাত্র বিরাম হইত না। সুপ্রসিদ্ধ মহাভারত গ্রন্থ প্রণয়ন করিতে ইচ্ছুক হইয়া তিনি অল্প দিনে সমাপন করিবার অভিলাষে এক জন দ্রুত লেখক অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। কোথায়ও না পাইয়া পরিশেষে গণেশকে আহ্বান করিয়া মনোগত অভিপ্রায় জানাইলেন। গণেশ অতি ক্ষিপ্রহস্ত ছিলেন; অনর্গল বলিয়া গেলেও তিনি অনায়াসে লিখিতে পারিতেন, একটি বর্ণও পড়িয়া যাইত না। তিনি কহিলেন "যদি আমার লেখনী ক্ষণমাত্র বিশ্রাম লাভ না করে, তাহা হইলে আমি আপনার লেখক হইতে পারি।" ব্যাস কিঞ্চিৎ চিন্তা করিয়া কহিলেন, "আমি তাহাতে সম্মত আছি, কিন্তু আমি যাহা বলিব, আপনি তাহার যথার্থ অর্থ হৃদয়ঙ্গম না করিয়া লিখিতে পারিবেন না।" গণেশ তাহাই স্বীকার করিলেন; কেন না তিনি কেবল লেখক ছিলেন না, সকল বিদ্যারও পারদর্শী ছিলেন। এই নিয়মে ভগবান গণেশ ব্যাস-রচিত মহাভারত লিখিতে আরম্ভ করেন। ব্যাস মধ্যে মধ্যে এক একটী এমত কূটার্থ শ্লোক রচনা করিতেন যে, তাহা বুঝিতে গণেশের অনেক সময় অতিবাহিত হইত। সেই অবসরে ব্যাস বহুতর শ্লোক রচনা করিয়া লইতেন। এই প্রকারে তিনি লক্ষাধিক শ্লোকময় বিস্তীর্ণ মহাভারত গ্রন্থ সমাপন করেন। উহার মধ্যে অষ্ট সহস্র অষ্ট শত অতি কূটার্থ শ্লোক আছে। উহাদিগকে ব্যাসকূট বলে। ব্যাস নিজে

বলিয়াছেন "ঐ সকল ব্যাসকূটের ভাব সংগ্রহ করিতে কেবল শুকদেব ও আমি পারি, সঞ্জয় পারেন কি না সন্দেহ।" ফল ব্যাসকূট সকল অত্যন্ত দুরূহ।

মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়নবেদব্যাস মহাভারত রচনা করিয়া প্রথমে স্বশিষ্য বৈশম্পায়নকে শিক্ষা দেন। বৈশম্পায়ন অর্জ্জুনের প্রপৌত্র রাজা জনমেজয়কে উহা প্রথমে শ্রবণ করান। তদবধি মহাভারতশ্রবণের প্রথা হইয়াছে। মহাভারত অতি বিস্তীর্ণ গ্রন্থ; ইহাকে পুরাণ, ইতিহাস, নীতিশাস্ত্র বা কাব্য যাহা ইচ্ছা বলা যায়। সর্ব্বপ্রকার বিষয়ই ইহাতে প্রচুর পরিমাণে বর্ণিত হইয়াছে। ইহাতে রাজনীতি, ধর্ম্মনীতি, সমাজনীতি, লোকযাত্রাবিধান, বাণিজ্য, কৃষি ও শিল্প শাস্ত্রের প্রকৃষ্ট নিয়মাদি, পূর্ব্বকালীন আচার ব্যবহার, রাজা, ঋষি প্রভৃতির জীবনচরিত ও বংশাবলী প্রভৃতি সমস্ত বিষয় উত্তম রূপে বর্ণিত হইয়াছে। মানবগণ ইহা হইতে সকল অবস্থার অনুরূপ উপদেশ প্রাপ্ত হইতে পারেন। অধিক কি, প্রবাদ এই যে, মহাভারতে যাহা আছে, তাহা অন্যত্র থাকিতে পারে কিন্তু উহাতে যাহা নাই তাহা কুত্রাপি নাই। কোন পণ্ডিত নিরপেক্ষ হইয়া ইহার আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়া দেখিলে, গ্রন্থকর্ত্তার আশ্চর্য্য অধ্যবসায়, অসামান্য কবিত্ব শক্তি ও গ্রন্থের প্রগাঢ় ভাবমাধুরির ভূয়সী প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারেন না। কল্পনা শক্তিতে বেদব্যাস পৃথিবীর অনেক মহাকবিকে পরাস্ত করিয়াছেন। কিন্তু রামায়ণের ন্যায় মহাভারতও অত্যুক্তি

দোষে দূষিত হওয়ায় ইহার যথার্থ আদর হয় না। মোটের উপর ধরিতে গেলে মহাভারতের তুল্য কাব্য পৃথিবীতে আর নাই।

ব্যাস বেদবিভাগ করেন। বেদে পদ্য, গদ্য ও গীতি তিন প্রকার রচনা আছে। এজন্য বেদের অপর একটী নাম ত্রয়ী। অঙ্গিরা বংশীয় মহর্ষি অথর্ব্বা উহা হইতে কিয়দংশ নির্ব্বাচন করিয়া স্বীয় নামে অর্থাৎ অথর্ব্ববেদনামে প্রচলিত করেন; মহর্ষিব্যাস ঐ ক্ষুদ্র অংশ ভিন্ন সমুদায় বেদ, রচনা অনুসারে ভাগত্রয়ে বিভাগ করেন। পদ্যময় রচনাবলী ঋক্‌নামে, গদ্যময় রচনাবলী যজু্‌ নামে এবং গীতিময় রচনাবলী সাম নামে প্রসিদ্ধ করেন। সেই অবধি এক বেদ চারিবেদ নামে খ্যাত হইল।

ব্যাস প্রথম পুরাণ সংগ্রহ কর্ত্তা অর্থাৎ তিনিই প্রথমে ইতিহাস লিখিতে আরম্ভ করেন। পূর্ব্বকালে যে সকল রাজবংশাবলী, সৃষ্টি বিবরণ প্রভৃতি লোকের মুখে ও প্রসঙ্গতঃ কোন কোন গ্রন্থে ছিল, বেদব্যাস সেই সমস্ত সংগ্রহ করেন ও আপন জীবৎকালে যে সকল ঘটনা প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন, তৎসমুদায় একত্র করিয়া এক খানি পুরাণ রচনা করেন। আখ্যান, উপাখ্যান, গাথা ও কল্প-শুদ্ধি এই চারি বিষয় তাঁহার পুরাণে লিখিত হয়। সেই পুরাণ তিনি লোমহর্ষণকে শিক্ষা দেন। এক্ষণে অষ্টাদশ পুরাণ ও অষ্টাদশ উপপুরাণ ব্যাস বিরচিত বলিয়া প্রথিত, কিন্তু তাহা সম্ভব নহে। কারণ যদি সমুদায় পুরাণগুলি

ব্যাসপ্রণীত হইত, তাহা হইলে কখনই এক এক বিষয়ে ভিন্ন ভিন্ন পুরাণে ভিন্ন ভিন্ন মত দৃষ্ট হইত না। পুরাণগুলি পাঠ করিলেই তাহা বিশেষ জানা যাইতে পারে। যিনি যখন যে পুরাণখানি প্রকাশ করিয়াছেন, তিনি সাধারণের সমধিক আদরণীয় হইবার জন্য তাহা ব্যাসপ্রণীত বলিয়া প্রচার করিয়াছেন। সুতরাং কোন্ খানি যে ব্যাসদেবের সুললিত লেখনী-বিনির্গত তাহা এখন নিশ্চয় করা যায় না। আমাদিগের প্রাচীন দর্শন শাস্ত্রের মধ্যে বেদান্ত দর্শন অতি উৎকৃষ্ট গ্রন্থ, তাহাতে বেদব্যাস আশ্চর্য্য ক্ষমতা প্রকাশ করিয়াছেন।

ব্যাস মহাকবি, দার্শনিক, ইতিহাসবিৎ ও ব্যবহার-কুশল ছিলেন। তৎকালপ্রচলিত বিদ্যামাত্রেরই তিনি পারদর্শী ছিলেন, এখনও অনেক সভ্যদেশে তাঁহার তুল্য সর্ব্বশাস্ত্রবিৎ পণ্ডিত দেখিতে পাওয়া যায় কি না সন্দেহ।

মহাকবি কালিদাস।

প্রায় দুই সহস্র বৎসর অতীত হইল কালিদাস ভারতবর্ষ অলঙ্কৃত করিবার জন্য জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। কেহ কেহ বলেন তিনি ১৪ শত বৎসর পূর্ব্বে আবির্ভূত হয়েন। কালিদাস বাল্যকাল কেবল ক্রীড়ায় অতিবাহিত করিয়াছিলেন, লেখা পড়ার নামও করেন নাই। বিবাহকাল পর্য্যন্ত তাঁহার বর্ণপরিচয়ও হয় নাই। প্রবাদ এই যে, তিনি যেমন মূর্খ ছিলেন, তাঁহার বুদ্ধিও তেমনই স্থূল ছিল। তিনি এত

দূর স্থূলবুদ্ধি ছিলেন যে, এক দিন গাছের ডালের আগায় বসিয়া সেই ডালের গোড়া কাটিতেছিলেন। ডাল পড়িয়া গেলে যে তৎসঙ্গে আপনি পড়িয়া যাইবেন,এ মোটা কথা তিনি বুঝিতে পারেন নাই। এই প্রবাদ নিতান্ত অলীক বোধ হয়। তিনি মুর্খ ছিলেন বটে, কিন্তু নির্ব্বোধ ছিলেন না। তাঁহার সুতীক্ষ্ণ বুদ্ধি তাঁহার কাব্য সকলে জাজ্জ্বল্যমান রহিয়াছে।

সারদানন্দন নামা নৃপতির বিদ্যোত্তমা নাম্নী এক কন্যা ছিলেন। সেই কন্যা যেরূপ রূপলাবণ্যবতী তদনুরূপ বিদ্যাবতীও ছিলেন। তিনি প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, যিনি তাঁহাকে বিচারে পরাস্ত করিবেন,তাঁহাকেই তিনি পতিত্বে বরণ করিবেন, অন্যথা তিনি বিবাহ করিবেন না। নানা দিগ্দেশ হইতে অনেক রাজকুমার ও পণ্ডিতবর্গ বিবাহার্থী হইয়া আসিয়া তাঁহার সহিত বিচারে পরাস্ত হয়েন। সকলে এইরূপ হতমান হইয়া বিদ্যোত্তমার উপর নিতান্ত বিরক্ত হইলেন এবং স্ত্রীলোকের এতাদৃশ ধৃষ্টতা ও অহঙ্কার দেখিয়া পরামর্শ করিলেন যে, কোনরূপে ইহার ফল স্বরূপ একটী মূর্খপতি ঘটাইয়া দিবেন। তাঁহারা চতুর্দ্দিকে মূর্খ অনুসন্ধান করিয়া কালিদাসকে ঈপ্সিত পাত্র স্থির করিলেন। কালিদাস পণ্ডিত বেশ ধারণ করিয়া বিদ্যোত্তমার সহিত বিচার করিতে উপস্থিত হইলেন। স্থির হইল, মৌখিক বিচার হইবে না, সাঙ্কেতিক বিচার হইবেক। কালিদাস যখন সভা প্রবেশ করেন, তখন পণ্ডিত মণ্ডলী ও রাজন্যবর্গ তাঁহাকে দেখিয়া মহা সম্ভ্রম সহকারে গাত্রোত্থান করি-

লেন ও মহাসমাদরে শ্রেষ্ঠ আসন প্রদান করিলেন। ইহাতে বিদ্যোত্তমা ভাবিলেন,যে, ইনি অবশ্যই একজন মহাবিখ্যাত পণ্ডিত হইবেন। বিচার আরম্ভ হইলে কালিদাস একটী অঙ্গুলি দেখাইলেন; বিদ্যোত্তমা ভাবিলেন,কালিদাস বুঝি এক ঈশ্বরের কথা বলিতেছেন। তিনি তাঁহার উত্তরে তিন অঙ্গুলি দেখাইলেন, অর্থাৎ এক ঈশ্বর হইতে সত্ব,রজঃ, তম ত্রিগুণাত্মক ব্রহ্মা, বিষ্ণু. মহেশ্বর হইয়াছেন। কালিদাস দুইটী অঙ্গুলি দেখাইলেন। বিদ্যোত্তমা বুঝিলেন কালিদাস পুরুষ ও প্রকৃতির কথা বলিতেছেন। এই প্রকারে কালি-দাসের যখন যাহা মনে আসিতে লাগিল, সেই প্রকারে অঙ্গুলি প্রদর্শন করিতে লাগিলেন। বিদ্যোত্তমা তাহার কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। সভাস্থ পণ্ডিতবর্গ ঐ সকল সঙ্কেতের এমনই চমৎকার অর্থ করিতে লাগিলেন ও কালিদাসের এতই প্রশংসা করিতে লাগিলেন, যে, তাহা-তেই বিদ্যোত্তমা পরাজয় স্বীকার করিলেন। কালিদাস বিচারে জয়লাভ করিলে মহা আড়ম্বরে বিদ্যোত্তমার সহিত তাঁহার বিবাহ হইল।

বিবাহানন্তর রজনীযোগে কালিদাস ও বিদ্যোত্তমা একত্র শয়ন করিয়া আছেন, ইতি মধ্যে একটী উষ্ট্রের শব্দ তাঁহাদের কর্ণে প্রবেশ করিল। বিদ্যোত্তমা জিজ্ঞাসা করি-লেন, "কিসের শব্দ শুনা যাইতেছে?" কালিদাস যে উত্তব দিলেন, তাহাতে তাঁহার বিদ্যা প্রকাশ হইয়া পড়িল। তিনি কহিলেন "উট্র ডাকিতেছে।" তাঁহার জড় জিহ্বা হইতে উষ্ট্র শব্দ নির্গত হইল না। বিদ্যোত্তমা শুনিবামাত্র এত

চমৎকৃত হইলেন, যে, প্রথমে তাঁহার বোধ হইল যে শুনিবার ভ্রম হইয়াছে। এজন্য পুনরায় কহিলেন, "কি বলিলে?" কালিদাস বিদ্যোত্তমার প্রশ্নের স্বর শুনিয়া বুঝিলেন যে, তিনি অশুদ্ধ বলিয়াছেন। এজন্য শুদ্ধ করিয়া বলিলেন "উষ্ট ডাকিতেছে।" প্রথমবারে 'ষ' ত্যাগ করিয়া বলিয়াছিলেন, এবারে 'র' উচ্চারণ হইল না। বিদ্যোত্তমা শ্রবণমাত্র শিরে করাঘাত পূর্ব্বক ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। তিনি বুঝিলেন পণ্ডিতেরা চাতুরী করিয়া ঘোরতর গণ্ড মূর্খের সহিত তাঁহার বিবাহ দিয়াছেন। অনেক পণ্ডিত ত্যাগ করিয়া শেষে তাঁহাকে যে গণ্ড মূর্খকে বিবাহ করিতে হইল, এই দুঃখ তাঁহার মর্ম্মভেদী হইল। তিনি দুঃখে হতচেতন হইয়া পড়িয়া রহিলেন ও নানাপ্রকার পরিতাপ বাক্যে রোদন করিতে লাগিলেন। কালিদাস ভার্য্যার ক্রন্দন ও পরিতাপ বাক্য শ্রবণ করিয়া এত লজ্জিত ও দুঃখিত হইলেন এবং আপনাকে এত ঘৃণিত বিবেচনা করিলেন যে, সেই মুহূর্ত্তেই আত্মহত্যা করিতে সঙ্কল্প করিলেন। কিন্তু পরিশেষে অনেক ভাবিয়া প্রতিজ্ঞা করিলেন, যদি সমধিক বিদ্যা উপার্জ্জন করিতে পারি, তবে গৃহে আসিব, নতুবা এ জন্মে আর দেশ দেখিব না।

কালিদাস তৎক্ষণাৎ গৃহ পরিত্যাগ করিয়া বিদ্যা শিখিবার জন্য যাত্রা করিলেন। দূর দেশে কোন আচার্য্যের নিকট উপস্থিত হইয়া দিবারাত্রি পরিশ্রম করিয়া বিদ্যা শিখিতে লাগিলেন। তাঁহার মনে ঈদৃশ লজ্জা দুঃখ ও ঘৃণার উদয় হইয়াছিল যে, কোন প্রকার শারী-

রিক ক্লেশকেই অধিক কষ্টকর বিবেচনা করিতেন না। সমুদায় কষ্টকে তুচ্ছ জ্ঞান করিয়া অহোরাত্র কেবল বিদ্যা শিক্ষা করিতেন। তাঁহার বুদ্ধি ও মেধা অতি তীক্ষ্ণ ছিল, সুতরাং অতি অল্প দিনের মধ্যেই তিনি নানা শাস্ত্রে পণ্ডিত হইলেন। এত অল্প দিনে এত অধিক বিদ্যা উপার্জ্জন করিয়াছিলেন, যে, লোকে তাঁহাকে সরস্বতীর বর পুত্র বিবেচনা করিতে লাগিল। কালিদাস এইরূপে বিদ্যালাভ করিয়া গৃহে গমন করিলেন এবং দুঃখ সন্তপ্তা রমণীর হৃদয়ে অতুল আনন্দ প্রদান করিলেন।

কালিদাসের যশঃ সৌরভ চতুর্দ্দিকে বিস্তীর্ণ হইতে লাগিল। উজ্জয়িনীর অধিপতি মহারাজা বিক্রমাদিত্য তাঁহাকে সভাসদ্ রূপে বরণ করিলেন। কালিদাস ক্রমে তাঁহার নব রত্নের শিরোরত্ন হইলেন।

কালিদাসের যে তীক্ষ্ণ বুদ্ধি ছিল, নিম্নলিখিত জন প্রবাদটী তাহার পোষকতা করিতেছে। ভোজনামা কোন নৃপতির সভামধ্যে কয়েক জন শ্রুতিধর ছিলেন। কোন শ্লোক বা গ্রন্থ কেহ একবার কেহ দুইবার কেহ তিন বার মাত্র শ্রবণ করিলে তাহা কণ্ঠস্থ করিতে পারিতেন। এজন্য ভোজরাজ ঘোষণা করিয়া দিয়াছিলেন, "যিনি আমার সভা মধ্যে কোন নূতন কবিতা বলিতে পারিবেন, তিনি লক্ষ মুদ্রা পারিতোষিক পাইবেন।" ঐ পারিতোষিকের লোভে নানা দেশ হইতে পণ্ডিত মণ্ডলী আসিয়া নূতন নূতন কবিতা রচনা করিয়া মহারাজকে শুনাইতেন। শ্রুতিধর পণ্ডিতেরা তৎক্ষণাৎ তাহা পুরাতন

কবিতা বলিয়া উপেক্ষা করত একে একে আবৃত্তি করি-তেন সুতরাং সকলেই নিরুত্তর হইয়া চলিয়া যাইতেন। কালিদাস ভোজরাজের এই চতুরতা বুঝিতে পারিয়া নিম্ন লিখিত কবিতাটী রচনা করিলেন।

"স্বস্তি শ্রীভোজরাজ! ত্রিভুবন বিজয়ী ধার্ম্মিকঃ সত্যবাদী
পিত্রা তে মে গৃহীতা নবনবতিযুতা রত্নকোটির্ম্মদীয়া।
তাং ত্বং মে দেহি তূর্ণং সকলবুধজনৈর্জ্ঞায়তে সত্যমেতৎ
নো বা জানন্তি কেচিৎ নবকৃতমিতি চেদ্দেহি লক্ষং ততো মে।"

অর্থাৎ মহারাজ! আপনার মঙ্গল হউক, আপনি ত্রিভুবন-বিজয়ী,ধার্ম্মিক ও সত্যবাদী। আপনার পিতা আমার নিকট হইতে ৯৯ কোটি স্বর্ণমুদ্রা গ্রহণ করিয়াছিলেন। আপনার সভাসদ পণ্ডিতেরা জানেন, অতএব তাহা আমাকে অবি-লম্বে প্রদান করুন। যদি পণ্ডিতবর্গ না জানেন, তবে আমি নূতন কথা বলিলাম, তজ্জন্য লক্ষ মুদ্রা পাইতে পারি। কালিদাস ভোজরাজ সমক্ষে এই কবিতা পাঠ করিলে, সভাসদ্বর্গকে পরাজয় স্বীকার করিতে হইল। কি প্রকারে তাঁহারা রাজাকে ঋণী বলিয়া স্বীকার করেন। এই প্রকারে কালিদাস একটী সামান্য কথায় পণ্ডিতবর্গকে পরাজয় করিয়াছিলেন। কালিদাসের বুদ্ধিমত্তার পরি-চায়ক ঐরূপ অনেক গল্প প্রচলিত আছে। তৎসমু-দায় সত্য না হইতে পারে, কিন্তু তিনি যে বিলক্ষণ বুদ্ধি সম্পন্ন ছিলেন, তাহা ঐ সকল দ্বারা বিশেষ প্রতিপন্ন হইতেছে।

কালিদাস রঘুবংশ ও কুমারসম্ভব কাব্য; অভিজ্ঞানশকু-

ন্তল, বিক্রমোর্ব্বশী ও মালবিকাগ্নিমিত্র নাটক ; মেঘদূত, নলোদয়, ঋতুসংহার, শৃঙ্গারতিলক ও মহা পদ্যশটক খণ্ড-কাব্য, এবং জ্যোতির্ব্বিদাভরণ* ও স্মৃতি চন্দ্রিকা নামক কালজ্ঞান গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। এই সমুদায় গ্রন্থেই কালিদাস আশ্চর্য্য কবিত্বশক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন। যিনি তাঁহার গ্রন্থ পাঠ করিবেন, তাঁহাকেই বলিতে হইবেক, তাঁহার তুল্য কবি পৃথিবীর কোন দেশে কোন কালে জন্ম গ্রহণ করেন নাই। ইংলণ্ডীয় মহাকবি সেক্ষপিয়র ভিন্ন কালিদাসের সহিত তুলনা করা যায় এমন ব্যক্তি পৃথিবীতে জন্মে নাই। সেক্ষপিয়র মানব-হৃদয় বর্ণন কার্য্যে কালিদাস অপেক্ষা

---

* কেহ কেহ জ্যোতির্বিদাভরণ মহাকবি কালিদাসপ্রণীত বলেন না। তৎপরিবর্ত্তে সেতুকাব্য তৎপ্রণীত বলেন। তাঁহারা আবার কহেন, কালিদাস দুই হাজার বৎসরের লোক নহেন, তিনি ১৪ শত বৎসর পূর্ব্বে বর্ত্তমান ছিলেন ও মাতৃগুপ্ত তাঁহারই নামান্তর। কালিদাসের জে্যাতির্বিদাভরণে লিখিত আছে, আমি রঘু প্রভৃতি গ্রন্থ লিখিয়া জ্যোতির্বিদাভরণ প্রস্তুত করিলাম। উক্ত পণ্ডিতগণ উক্ত জ্যোতির্বিদাভরণ অপর কোন কালিদাস কৃত বলেন। তাহার কারণ এইমাত্র নির্দ্দেশ করেন যে, যে লেখনী হইতে রঘুবংশ শকুন্তলা প্রভৃতি নিঃসৃত হইয়াছে, জ্যোতির্বিদাভরণ সে লেখনী প্রসূত নহে। তাহার রচনা তত উৎকৃষ্ট নহে বটে, কিন্তু তাহা হইলে মালবিকাগ্নিমিত্র নাটক কালিদাসের বলা যায় না। শকুন্তলার রচনার সহিত তুলনা করিলে মালবিকাগ্নি-মিত্রের রচনা অতি জঘন্য বোধ হয়। যখন দুই খানি নাটকের রচনায় এত প্রভেদ, তখন কাব্যের সহিত জ্যোতিষগ্রন্থের রচনার কত প্রভেদ হইতে পারে? যাহা হউক বালকশিক্ষার জন্য উভয় মতই গ্রহণ করা গেল।

শ্রেষ্ঠ ছিলেন, কিন্তু অপর সকল বিষয়ে কালিদাস শ্রেষ্ঠ। তাঁহার রচনায় এমনই মধুরতা আছে, যে, তাহা শ্রবণমাত্র মন মোহিত হয়, অর্থগ্রহ না হইলেও মিষ্ট বোধ হয়। প্রবাদ এই যে, কর্ণাটাধিপতি তাঁহার মুখনিঃসৃত চারিটী কবিতা শ্রবণ করিয়া এরূপ মুগ্ধ হইয়াছিলেন, যে, তাঁহার সমুদায় রাজ্য তাঁহাকে দান করেন। অধিক কি, জর্ম্মাণ দেশীয় মহাকবি গেটে অভিজ্ঞান শকুন্তলার ইংরাজী অনুবাদের জর্ম্মাণ অনুবাদ পাঠে পুলকিত হইয়া লিখিয়াছেন "যদি কেহ বসন্তের পুষ্প ও শরদের ফল লাভের অভিলাষ করে, যদি কেহ চিত্তের আকর্ষণ ও বশীকরণকারী বস্তুর অভিলাষ করে, যদি কেহ প্রীতিজনক ও প্রফুল্লকর বস্তুর অভিলাষ করে, যদি কেহ স্বর্গ ও পৃথিবী এই দুই এক নামে সমাবেশিত করিবার অভিলাষ করে, তাহা হইলে হে অভিজ্ঞান শকুন্তল! আমি তোমার নাম নির্দ্দেশ করি এবং তাহা হইলেই সকল বলা হইল।" এক জন বিদেশী একখানি অনুবাদের অনুবাদ পাঠ করিয়া যখন এরূপ প্রশংসা করিলেন তখন আমরা আর কি বলিয়া তাঁহার ক্ষমতার পরিচয় দিব। কালিদাসের নাম অতি সামান্য লোক পর্য্যন্তও জানে। সামান্য একটী প্রহেলিকা বলিয়া লোকে তাহার সমাদর জন্য "কহে কবি কালিদাস" বলিয়া শেষ করিয়া দেয়। ফল কালিদাসের তুল্য মহাকবি পৃথিবীতে আর জন্ম গ্রহণ করেন নাই।

কালিদাসের উপমা অতি চমৎকার। "তিনি এরূপ

শাক্যসিংহ বুদ্ধ।

শাক্যসিংহ প্রায় ২৫ শত বৎসর পূর্ব্বে হিমগিরি সমীপস্থ ভাগিরথীতীরে কোশলরাজ্য মধ্যে কপিলাবাস্তু গ্রামে মায়া দেবীর গর্ব্ভে জন্ম গ্রহণ করেন। শাক্যবংশোদ্ভব শুদ্ধোদন রাজা তাঁহার জনক। অগ্রহায়ণ মাসে একদা মায়া দেবী লুম্বিনী নামক মনোহর উদ্যান দর্শন করিতে গমন করিয়াছিলেন। তথায় উদ্যানের মনোহর শোভা দর্শন করিয়া ভ্রমণ করিতেছেন, এমত সময়ে হঠাৎ প্রসববেদনা উপস্থিত হইলে, মায়াদেবী একটী বৃক্ষের শাখা অবলম্বন করিয়া সেই বৃক্ষতলে শাক্যসিংহকে প্রসব করেন। তিনি জন্ম গ্রহণ করাতে শুদ্ধোদন রাজার মনোভিলাষ সর্ব্বতোভাবে পূর্ণ হওয়ায় তাঁহার নাম সিদ্ধার্থ ও সর্ব্বসিদ্ধার্থ রাখিলেন। শাক্যবংশের মধ্যে তিনি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ছিলেন, এজন্য তিনি পরে শাক্যসিংহ নামে বিখ্যাত হয়েন এবং তাঁহার গৌতম গোত্র ছিল বলিয়া তাঁহার আর একটী নাম গৌতম।

শাক্যসিংহের জন্মের ৭ দিন পরে তাঁহার মাতার মৃত্যু হয়। তাঁহার পিতৃব্যপত্নী গৌতমী তাঁহাকে লালন পালন করেন। তাঁহার পিতা অতি অল্প বয়সেই তাঁহার বিদ্যাশিক্ষার্থে সুযোগ্য শিক্ষক নিযুক্ত করেন। তিনি অনতিবিলম্বে স্বকীয় অসাধারণ বুদ্ধিশক্তি দর্শাইয়া সকলকে চমৎকৃত করিলেন। শস্ত্র ও শাস্ত্র উভয় বিদ্যাতেই বিলক্ষণ পণ্ডিত হইলেন। তিনি এরূপ বলশালী ছিলেন

যে, একদা রাজপথে একটী বৃহৎ বৃক্ষ পতিত দেখিয়া অবলীলাক্রমে তুলিয়া ফেলিয়া দেন। কিঞ্চিৎ বয়ঃপ্রাপ্ত হইলেই তিনি সহাধ্যায়ীদিগের সহিত ক্রীড়া না করিয়া তৎপরিবর্ত্তে নিবিড় গহনের মধ্যস্থিত নির্জ্জন প্রদেশে উপবিষ্ট হইয়া চিন্তা করিতেন। কপিলাবাস্তুর অধিপতি পুত্রের এই প্রকার অবস্থা জানিতে পারিয়া তাঁহাকে চিন্তা হইতে নিবৃত্ত করিবার নিমিত্ত শীঘ্র তাঁহার বিবাহ দিতে সঙ্কল্প করিলেন। রাজমন্ত্রীগণ তাঁহার নিকট বিবাহের প্রস্তাব করিলে, তিনি কহিলেন যদি তাঁহার মনোমত কন্যা হয় তবে তিনি বিবাহ করিবেন। রাজা অনেক অনুসন্ধান করিয়া দণ্ডপাণির গোপা নাম্নী ভুবনমোহিনী দুহিতার সহিত তাঁহার বিবাহ স্থির করিলেন। প্রথমে দণ্ডপাণি শাক্যসিংহকে মনুষ্যত্বহীন ও সহজজ্ঞানশূন্য স্থির করিয়া তাঁহার সহিত আপনার বিবিধগুণসম্পন্না কন্যার বিবাহ দিতে অসম্মত হয়েন। কিন্তু পরিশেষে তাঁহাকে অসাধারণ বুদ্ধিমান ও বীর্য্যবান্ জানিতে পারিয়া আহ্লাদপূর্ব্বক কন্যা সম্প্রদান করেন। কথিত আছে, দণ্ডপাণির প্রতিজ্ঞা ছিল, যিনি শিল্প বিদ্যায় সুনিপুণ হইবেন তাঁহাকেই তিনি কন্যাদান করিবেন। শাক্যসিংহ সমস্ত শিল্প বিদ্যায় নিপুণতা দেখাইয়াছিলেন। তিনি গোপার তুল্য পরম সুন্দরী ও সর্ব্বগুণান্বিতা রমণী পাইয়াও যশোধরা ও উৎপলবর্ণা নাম্নী অপর দুই কন্যাকে বিবাহ করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে যশোধরার গর্ব্ভে রাহুল নামে তাঁহার এক পুত্র জন্মে।

যদিও শাক্যসিংহ রাজকুলে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন, ও বাল্যাকালাবধি সুখস্বচ্ছন্দে যাপন করিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি কখন ঐ সকল সুখে আসক্ত হয়েন নাই। তিনি সর্ব্বদাই বন্ধুবর্গকে বলিতেন 'পাপময় পৃথিবীতে কিছুই স্থির নহে, কিছুই সত্য নহে, সকলই অসত্য। জীবন কাষ্ঠদ্বয়ের ঘর্ষণোৎপন্ন অগ্নিকণার ন্যায় প্রজ্বলিত হইবার মুহূর্ত্তেক পরে বিলয় প্রাপ্ত হয়। কে জানে কোথা হইতে এই জীবন আসিল ও কোথায় গমন করিবে? ইহা বীনাশব্দের ন্যায়, জ্ঞানী পণ্ডিত গণের ইহার আগমন ও প্রতিগমনের স্থান নির্ণয় করা বৃথা।' যখন তিনি কোন বৃদ্ধ, আতুর বা মৃত ব্যক্তি দর্শন করিতেন, তখনই তিনি ভাবিতেন, মনুষ্য মাত্রেই এইরূপ জরা, রোগ ও মরণের অধীন; এ দেহের গৌরব করা বৃথা। এই সকল ভাবিতে ভাবিতে তিনি এরূপ একাগ্রচিত্ত হইতেন, যে একবারে বাহ্যজ্ঞান শূন্য হইতেন। রাজা পুত্রের মানসিক অবস্থার এতাদৃশ পরিবর্ত্তন অবগত হইয়া তাঁহাকে ঐ চিন্তা হইতে নিবৃত্ত করিবার জন্য নানা প্রকার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কিন্তু সকল চেষ্টাই বিফল হইল।

একদা ঊনবিংশ বর্ষ বয়ঃক্রম কালে শাক্যসিংহ এক কৃষকের কুটীরে গমন করিয়া তাহার ও তৎপরিবারের নিতান্ত দুরবস্থা দর্শন করিয়া অত্যন্ত চিন্তাকুল হইলেন, ও সামান্য সাংসারিক অনিত্য সুখের বিষয় চিন্তা করিতে করিতে উদ্যানমধ্যস্থ এক জম্বুবৃক্ষতলে বসিলেন। বৃক্ষের ছায়ায় বসিয়া জগতের আদি, অন্ত ও মনুষ্যের

ক্ষণভঙ্গুর সুখের বিষয় চিন্তা করিতেছেন, এমন সময়ে এক সন্ন্যাসী তাঁহার নয়নপথে পতিত হইলেন। তাঁহাকে দেখিয়া যুবরাজ মনে মনে ভাবিলেন, সন্ন্যাসাশ্রমই সর্ব্বোৎকৃষ্ট। ইহাই প্রশংসনীয় এবং ইহাই অনুধাবনীয়। সন্ন্যাসীজীবন সকলের পক্ষে শ্রেয় এবং ইহা সর্ব্বকালে বিজ্ঞগণকর্ত্তৃক প্রশংসিত হইয়া আসিতেছে। এইরূপ চিন্তা করিয়া সন্ন্যাস ধর্ম্ম অবলম্বন করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। গৃহে আসিয়া পিতা ও সহধর্ম্মিণীগণের নিকট আপনার কঠোর অভিপ্রায় ব্যক্ত করিলেন। তাঁহারা তাঁহাকে নানা সদুপদেশ প্রদান করিয়া ঐ সঙ্কল্প হইতে নিবৃত্ত করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। গোপা প্রেমপূর্ণবচনে কত বুঝাইলেন এবং বিচ্ছেদ নিমিত্ত হৃদয়বিদারক নানাপ্রকার খেদ ও আর্ত্তনাদ করিতে লাগিলেন। কিন্তু তিনি কিছুই বুঝিলেন না। সেই দিন "দ্বিপ্রহর রজনী কালে নিদাঘ নিশীথ সময়ে নিঃশব্দপাদসঞ্চারে শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিয়া রাজ বাটীর দ্বারবান্ ও রক্ষকগণকে সুষুপ্ত অবস্থায় দর্শন করিয়া সহধর্ম্মিণীর হৃদয় বিদারক খেদবাক্য, পিতার প্রেম ও স্নেহপূর্ণ বাক্যাবলী তাচ্ছিল্য করিয়া সংসারের মায়া পরিত্যাগ করিয়া, ধর্ম্মের জন্য উন্মত্ত হইয়া, সুখের আলয় সুরম্য রাজপ্রাসাদ পরিত্যাগ করিলেন এবং অশ্বালয় হইতে এক বায়ুবেগগামী বলবান্, সুশ্রী তুরঙ্গোপরি আরোহণ করিয়া কেবল উক্ত ঘোটকের, রক্ষককে সমভিব্যাহারে লইয়া সমস্তরাত্রি নিবিড় নিশাচর-পরি-

পূরিত বিপদ-পরিপূর্ণ গহনমধ্য দিয়া ভ্রমণ করিয়া উষা সময়ে অশ্ব হইতে অবরোহণ করিলেন ও অশ্ব-রক্ষককে নিজ বহুমূল্য স্বর্ণ-হীরা-সম্বলিত গাত্রাভরণ-সকল দান করিয়া কপিলাবাস্তু নগরে পুনঃ প্রেরণ করিলেন।” কহিলেন পিতা ও বন্ধুবর্গকে কহিবে তাঁহারা যেন আমার নিমিত্ত শোকাকুল না হয়েন। তত্ত্বজ্ঞান লাভ হইলেই আমি আসিয়া তাঁহাদিগকে দর্শন করিব।

ভৃত্য প্রস্থান করিলে তিনি সেই স্থানেই খড়্গ দ্বারা শিখা ছেদন ও স্বীয় বেশ পরিত্যাগ পূর্ব্বক গৈরিক-রঞ্জিত বসন পরিধান করিয়া যাত্রা করিলেন। তিনি প্রথমে বৈষাল নামক নগরে গমন করিয়া তিন শত সন্ন্যাসী-শিষ্য বেষ্টিত এক জন সুবিখ্যাত ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের নিকটজ্ঞানধর্ম্ম শিক্ষা করিতে লাগিলেন। কিন্তু তাঁহার নিকট যে উপদেশ লাভ করিলেন, তাহাতে তাঁহার সম্যক তৃপ্তি হইল না অর্থাৎ সংসারসাগর হইতে পরিত্রাণ পাওয়া যায়, এমন কোন সদুপদেশ তাঁহার নিকট পাইলেন না। তখন তিনি মগধ দেশের রাজধানী রাজগৃহ নগরে অপর এক ব্রাহ্মণ আচার্য্যের নিকট গমন করেন। তাঁহার নিকটেও ঐরূপ ঈপ্সিতফল লাভের সম্ভাবনা না দেখিয়া তথা হইতে প্রস্থান করিলেন। মগধরাজ বিম্বসার তাঁহার আচার ব্যবহারে অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া তথায় তাঁহাকে রাখিবার অনেক চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি কিছুতেই থাকিলেন না। এই স্থানে তিনি নিজ মতানুযায়ী পাঁচ জন শিষ্য প্রাপ্ত হয়েন।

শাক্য সিংহ রাজগৃহ নগর পরিত্যাগ করিয়া পঞ্চ শিষ্য সমভিব্যাহারে নিকটবর্ত্তী এক কাননে ছয় বৎসর অতি কঠোর তপঃসাধন করেন। ছয় বৎসর অতীত হইলে তাঁহার মনে বিশ্বাস জন্মিল যে, "তাপসব্রত আত্মাকে শান্তি এবং মনকে পরিশুদ্ধ না করিয়া তদ্বিপরীতে ধর্ম্মপথের ব্যাঘাত ও বাধাস্বরূপ হইয়া উঠে।" আরও তিনি দেখিলেন যে অনাহারে তাঁহার শরীর অত্যন্ত দুর্ব্বল হইয়াছে ও বুদ্ধিরও অল্পতা হইতেছে। তখন তিনি তাপসব্রতের কঠোর নিয়মাদি পরিত্যাগ করিয়া উত্তমরূপ পানভোজন আরম্ভ করিলেন। তদীয় শিষ্যগণ তাঁহাকে ধর্ম্মত্যাগী বিবেচনায় পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল। তাহাতে তিনি কিছুমাত্র দুঃখ বা অপমান বোধ করিলেন না। প্রত্যুত তদবধি নির্জ্জনে থাকিয়া অনন্যমনে ধর্ম্মালোচনা করিতে লাগিলেন; ব্রাহ্মণ আচার্য্য গণের সঙ্কীর্ণ মতসমূহ ও কঠোর তাপসব্রত মনুষ্যবর্গকে মুক্তি প্রদান করিতে পারে না এই বিশ্বাস ক্রমে তাঁহার মনে দৃঢ়ীভূত হইল। তখন যথার্থ মুক্তির পথ কি, কি করিলে মানবগণ দুঃখময় সংসারের দুঃখরাশি হইতে বিমুক্ত হইতে পারে এই চিন্তা তাঁহার মনে বলবতী হইল। বহুদিন চিন্তা করিয়া যাহা তিনি স্থির করিলেন, তাহাই যে মুক্তির একমাত্র পথ, তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ রহিল না। এই সময় হইতে তিনি বুদ্ধ (অর্থাৎ জ্ঞানী) নাম প্রাপ্ত হইলেন। তখন তাঁহার বয়ঃক্রম ৩৬ বৎসরমাত্র। মহর্ষি কপিলকৃত নিরীশ্বর সাংখ্য দর্শনই তাঁহার এই নূতন ধর্ম্মের মূল।

এক্ষণে তাঁহার ধর্ম্ম পৃথিবীস্থ মনুষ্যবর্গের নিকট প্রচার করিবার নিমিত্ত উৎসুক হইলেন। মনুষ্যবর্গ অজ্ঞান-কূপে নিমগ্ন রহিয়াছে ও অলীক ধর্ম্মে বিশ্বাস করিয়া প্রকৃত পথের অনুসরণ করিতেছে না দেখিয়া, তাহাদিগকে সত্য-ধর্ম্ম শিক্ষা দিবার জন্য ব্যগ্র হইলেন। এই উদ্দেশে তিনি প্রথমে বিদ্যা ও ধর্ম্মালোচনার প্রধান স্থান বারাণসী নগরে গমন করিলেন। তথায় প্রথমে পূর্ব্বত্যক্ত সেই পঞ্চশিষ্যকে তাঁহার ধর্ম্মে দীক্ষিত করিলেন। ক্রমে তথায় সহস্র সহস্র নগরবাসী তাঁহার ধর্ম্মে বিশ্বাস করিল। তথা হইতে ৬০ জন শিষ্য সঙ্গে লইয়া রাজগৃহ নগরে গমন করেন। তথাকার কালান্তক নামক সুপ্রসিদ্ধ রাজদত্ত মঠে তিনি কয়েকটী গভীর ভাব, রস ও নীতিপরিপূর্ণ বক্তৃতা করেন এবং কাত্যায়ন প্রভৃতি কতিপয় প্রধান ব্যক্তিকে বিচারে পরাজয় করিয়া তাঁহাদিগকে স্বমতে আনয়ন করেন। ঐ কাত্যায়ন তাঁহার আদেশে উজ্জয়িনী নগরে গমন করিয়া তথাকার রাজা ও প্রজা সকলকে বৌদ্ধ ধর্ম্মে দীক্ষিত করেন। পরে শাক্যসিংহ শ্রাবস্তী নগরে গমন করিয়া বহুকাল বাস করেন ও তথায় থাকিয়া ধর্ম্ম সূত্র প্রচার ও কোশলের রাজা প্রশেনজিত প্রভৃতি অনেক প্রধান ২ ব্যক্তিকে স্বধর্ম্মে দীক্ষিত করেন। এই প্রকারে শাক্যসিংহ মথুরা, উজ্জয়িনী, কামরূপ, বিন্ধ্যাচল প্রভৃতি ভারতবর্ষের মধ্যে ও উত্তর দেশে ভ্রমণ ও তথাকার অধিকাংশ লোককে স্বধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়াছিলেন। গঙ্গার উত্তর ও দক্ষিণ

তীরস্থ রাজাদিগের পরস্পর ভয়ানক বিবাদ ছিল, তিনি তাহা ভঞ্জন করিয়া দেন এবং অবশেষে তাঁহাদিগকে স্বমতে আনয়ন করেন।

মহারাজ শুদ্ধোদন তাঁহাকে কপিলাবাস্তুতে আনিবার জন্য একবার ৮ জন দূত প্রেরণ করিয়াছিলেন কিন্তু তাহারা শাক্যসিংহের সুমধুর বক্তৃতা শ্রবণে তাহা ভুলিয়া গেল ও তাঁহার ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া তাঁহার সহিত বাস করিতে লাগিল। পরে রাজা চর্ক নামা একজন মন্ত্রীকে পাঠাইয়াছিলেন। তিনিও দূতগণের ন্যায় শাক্যসিংহের ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া তাঁহার সহিত বাস করেন। পরিশেষে রাজা কপিলাবাস্তুতে ন্যগ্রোধ নামক এক বিহার নির্ম্মাণ করিয়া তথায় পুত্রকে আনয়ন করেন। শাক্যসিংহ বুদ্ধ হইবার দ্বাদশ বৎসর পরে ঐ বিহারে আসিয়া পিতার সহিত সাক্ষাত করেন। তথায় তিনি শাক্যবংশীয় সকলকেই নিজধর্ম্মাবলম্বী করিয়াছিলেন। রমণীদিগের মধ্যে সর্ব্বপ্রথমে তাঁহার সহধর্ম্মিণী ও পিতৃব্যপত্নী তাঁহার ধর্ম্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।

এই প্রকারে তিনি এক নূতন ধর্ম্ম সৃষ্টি ও প্রচার করিয়া ৮০ বৎসর বয়ঃক্রম কালে শালবৃক্ষদ্বয়ের তলে উদরাময় রোগে প্রাণত্যাগ করেন। কেহ কেহ আসামের অন্তঃপাতী কুশীগ্রামে ও কেহ কেহ বারাণসী ও পাটনার মধ্যবর্ত্তী গণ্ডক নদতীরস্থ কুশীনর তাঁহার মৃত্যুস্থান নির্দ্দেশ করেন। তাঁহার অনুমতি অনুসারে তাঁহার মৃতদেহ তৎকালীন সম্রাটদিগের রীতি অনুসারে দাহন

করা হয়। তাঁহার দেহাবশেষ ভস্ম লইয়া মগধ, প্রয়াগ, কপিলাবাস্তু প্রভৃতি অষ্ট দেশে পরস্পর বিবাদ হইয়া ঘোরতর যুদ্ধ হইবার উপক্রম হইয়াছিল। পরিশেষে এক ব্রাহ্মণ ঐ ভস্ম আট ভাগে বিভক্ত করিয়া বিবাদ মিটাইয়া দেন। সকলেই আপনাপন দেশে ঐ ভস্মোপরি এক এক চৈত্য নির্ম্মাণ করেন। ঐ ভস্ম বিভাগকারী ব্রাহ্মণ ভস্মপাত্র ও অপর এক ব্যক্তি চিতাবশেষ অঙ্গার লইয়া তদুপরি পৃথক্ ২ চৈত্য নির্ম্মাণ করিলেন। ঐ সকল চৈত্যের কয়েকটা অদ্যাপি বর্ত্তমান রহিয়াছে। কথিত আছে, তাঁহার চারিটী দন্ত এতদ্দেশের স্থানে স্থানে নীত হইয়াছিল।

শাক্যসিংহ রাজকুলে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু বৃক্ষতলে জন্মগ্রহণ ও বৃক্ষতলে মানবলীলা সম্বরণ করেন এবং বৃক্ষতলে বসিয়াই পিতা, পুত্র, স্ত্রী, রাজ্য, ধন ও সমস্ত সুখ বিসর্জ্জন দিয়া সন্ন্যাস ধর্ম্ম অবলম্বন করেন। তিনি এমনি চমৎকার ধর্ম্মমত স্থাপন করেন যে তাহার নিকট সকল ধর্ম্মই খর্ব্ব হইয়া গেল, ভারতবর্ষ হইতে হিন্দু-ধর্ম্ম প্রায় উঠিয়া যাইবার উপক্রম হইল। যদি শঙ্করাচার্য্য জন্ম গ্রহণ না করিতেন তাহা হইলে এতদিন হিন্দু ধর্ম্মের দশা কি হইত বলা যায় না। যদিও শঙ্করাচার্য্য ভারতবর্ষ হইতে বৌদ্ধধর্ম্ম দূরীকৃত করেন তথাপি অপর দেশে উহার প্রভা এত বৃদ্ধি হইয়াছে যে অদ্যাপি পঁয়তাল্লিশ কোটি মনুষ্যকে বৌদ্ধ ধর্ম্মবলম্বী দেখা যায়। পৃথিবীতে অন্য কোন ধর্ম্মাবলম্বী লোক এত অধিক দেখিতে পাওয়া যায় না।

শাক্যসিংহ কেবল বৌদ্ধদিগের মধ্যে পুজিত ছিলেন

না। হিন্দুরাও তাঁহার বিশেষ মান্য করিয়া থাকেন। হিন্দুশাস্ত্রকারেরা বুদ্ধকে বিষ্ণুর অবতার বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন।

শঙ্করাচার্য্য।

সুপ্রসিদ্ধ শঙ্করাচার্য্য মালবর প্রদেশে নাম্বুরী ব্রাহ্মণ বংশে জন্মগ্রহণ করেন। কেহ কেহ বলেন, কর্ণাট দেশান্তর্গত তুঙ্গভদ্রা নদীতীরবর্ত্তী শিঙ্গাভেরী নামক নগর তাঁহার জন্ম স্থান তিনি কোন সময়ে প্রাদুর্ভূত হন তাহার স্থিরতা নাই। কেহ কেহ বলেন সহস্র বৎসর হইল তাঁহার জন্ম হয়। কাহারও মতে অষ্টম শতাব্দী তাঁহার আবির্ভাবকাল। অষ্টমবর্ষ বয়ঃক্রমকালে উপনয়ন হইলে শঙ্করাচার্য্য বেদাধ্যয়নে প্রবৃত্ত হয়েন। তাঁহার এরূপ চমৎকার মেধা, সুতীক্ষ্ণ বুদ্ধি ও দৃঢ় অধ্যবসায় ছিল যে, দ্বাদশবর্ষ বয়ক্রমকালে সর্ব্ব শাস্ত্রে অসাধারণ ব্যুৎপত্তি জন্মিয়াছিল। অতি সুকুমার বয়সে তাঁহার অতিশয় তীক্ষ্ণ বুদ্ধি ও প্রৌঢ়তা দর্শনে সকলেই বিস্ময়াপন্ন হইয়াছিল। এই সময়ে তাঁহার পিতার পরলোক প্রাপ্তি হয়। সুতরাং সংসারের সমুদায় ভার তাঁহার উপর পড়িল। কিন্তু শঙ্করাচার্য্য এরূপ দুরবস্থায় পড়িয়াও বিদ্যাশিক্ষায় বিরত হয়েন নাই। এমন কিছু অর্থ ছিলনা যে, তদ্দ্বারা অনায়াসে দিনপাত হইতে পারে, সুতরাং তাঁহাকে জীবনোপায় সংস্থান ও সাংসারিক সমু-

দায় কার্য্য সমাধা করিতে হইত। যে অবসর পাইতেন, তাহা কেবল বিদ্যা শিক্ষাতেই যাপন করিতেন ক্ষণমাত্রও বিশ্রাম করিতেন না।

অতি অল্প বয়সে সন্ন্যাস ধর্ম্ম গ্রহণে তাঁহার অত্যন্ত অভিলাষ হইয়াছিল, কেবল তাঁহার মাতার স্নেহ-পূর্ণ কাতর বাক্য তখন তাঁহারে সে অভিপ্রায় হইতে বিরত করে। তিনি দার-পরিগ্রহ করেন নাই। তাঁহার মাতা অনেক অনুরোধ করিলেও, তিনি কোন মতে দারগ্রহণে সম্মত হয়েন নাই, মনে মনে স্থির করিয়াছিলেন, যে, অকৃতদার হইয়া ঈশ্বরারাধনা ও ধর্ম্ম চিন্তাতে জীবন প্রবাহিত করিবেন। প্রতিক্ষণই সন্ন্যাস ধর্ম্ম গ্রহণের উপায় অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। কিরূপে মাতার অনুমতি গ্রহণ করিবেন, এই চিন্তাই তাঁহার হৃদয়ে বলবতী হইয়া উঠিল।

একদা শঙ্করাচার্য্য মাতার সহিত গ্রামের অনতিদূরে কোন আত্মীয়ের ভবনে গমন করিয়াছিলেন। পথিমধ্যে একটী ক্ষুদ্র নদী ছিল। সেই নদীর জল নিতান্ত অল্প, এজন্য সকলে অনায়াসে তাহা পার হইতে পারিত, নৌকাদির প্রয়োজন হইত না। শঙ্করাচার্য্য গমন কালে অনায়াসে নদী পার হইয়া গেলেন, কিন্তু প্রত্যাগমন সময়ে দেখিলেন বৃষ্টির জলে নদী পরিপূর্ণ হইয়াছে, পার হইবার আর কোন উপায় নাই। ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া তাঁহারা পার হইবার জন্য নদী গর্ব্ভে অবতরণ করিলেন। কিন্তু নদীর জল এত বৃদ্ধি হইয়াছিল যে, কিছু দূর গেলেই

তিনি প্রথমে কর্ণাট দেশে গমন ও তথায় কিয়ৎকাল অবস্থিতি করিয়া বিবিধ ধর্ম্মশাস্ত্র ও দর্শনশাস্ত্র শিক্ষা করিলেন। সেই স্থানে তিনি বৌদ্ধধর্ম্মশাস্ত্রও শিক্ষা করিয়াছিলেন। সকল শাস্ত্র পাঠ করিয়া তাঁহার মনে এই দৃঢ় বিশ্বাস হইল যে, এক অনাদি অনন্ত ঈশ্বর এই জগতের মূল। কেন না ভিন্ন ভিন্ন শাস্ত্রকারেরা কেহ ব্রহ্মা, কেহ বিষ্ণু, কেহ শিব, কেহ শক্তিকে জগৎকর্ত্তা ঈশ্বর বলিয়া নির্দ্দেশ করিলেও তাঁহারা যে পরস্পর ভিন্ন নহেন, তাহাও ঐ সকল শাস্ত্রকারেরা স্পষ্ট প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহার মনে ইহাও বিশ্বাস হইল যে, প্রকৃত ঈশ্বর জ্ঞানে সামান্য মৃৎপিণ্ডকে উপাসনা করিলেও ঈশ্বরোপাসনার ফল লাভ হয়। সুতরাং যদিও ভিন্ন ভিন্ন শাস্ত্রে ভিন্ন ভিন্ন মত আছে, তাঁহার সুতীক্ষ্ণ বুদ্ধিতে সকলই সমান বোধ হইল। কিন্তু বৌদ্ধদিগের 'ঈশ্বর নাই' শব্দ তাঁহার কর্ণে নিতান্ত অসহ্য হইল। সে সময়ে বৌদ্ধধর্ম্ম ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র পরিব্যাপ্ত হইয়াছিল। হিন্দু ধর্ম্মের তখন এমন দুরবস্থা যে, সে সময়ে শঙ্করাচার্য্য জন্ম গ্রহণ না করিলে, অতি অল্প দিনেই উহার লয় হইত। শঙ্করাচার্য্য সেই নাস্তিকতামূলক বৌদ্ধধর্ম্ম ভারতবর্ষ হইতে বিদূরিত করিবার জন্য কৃতসঙ্কল্প হইলেন।

কাঞ্চীপুরের অধিপতি হিমশীতল নরপতি বৌদ্ধ ধর্ম্মের নিতান্ত পক্ষপাতী ছিলেন। প্রধান প্রধান বৌদ্ধ পণ্ডিতে তাঁহার সভা সুশোভিত থাকিত। শঙ্করাচার্য্য প্রথমেই সেই স্থানে গমন করিয়া বৌদ্ধ ধর্ম্মের অলীকতা

প্রকাশ করিলে রাজা ও পণ্ডিত মণ্ডলী নিতান্ত ক্রুদ্ধ হই-লেন। শঙ্করাচার্য্য বিচারের প্রার্থনা করিলে রাজা নিতান্ত রোষপরবশ হইয়া কহিলেন, বৌদ্ধ ধর্ম্মের অলীকতা প্রমাণ করিবার চেষ্টা করা সামান্য ধৃষ্টতার কর্ম্ম নহে। অনেক বাদানুবাদের পর স্থির হইল, যিনি বিচারে পরাস্ত হইবেন, তাঁহাকে ঘানি টানা দণ্ডভোগ করিতে হইবে। রাজা তজ্জন্য নানা স্থান হইতে প্রধান প্রধান বৌদ্ধ পুরোহিতগণকে আমন্ত্রণ করিয়া আনয়ন করিলেন। তাঁহাদিগের সহিত শঙ্করাচার্য্যের অনেক বিচার হইল। তাঁহার অকাট্য যুক্তিবলে বৌদ্ধদিগের কূট তর্কজাল ছিন্ন ভিন্ন হইয়া গেল। সকল পণ্ডিতকেই তাঁহার নিকট পরাজয় স্বীকার করিতে হইল। রাজা তাহাদিগকে সমুচিত দণ্ড প্রদান করিয়া স্বয়ং শঙ্করাচার্য্যের মতের অনুবর্ত্তী হইলেন। শঙ্করাচার্য্যের এই বিজয়বিবরণ শিবকাঞ্চী নামক স্থানের শ্মশানেশ্বর শিবের মন্দিরের দ্বারদেশে ও ভগবতী নদীর তীরস্থিত তেরুকোভেরুলির দেবমন্দিরে প্রস্তরফলকে অঙ্কিত আছে। কাঞ্চীপুর হইতে তিনি তিরুপতিকানম স্থানে যাত্রা করেন। সেখানেও তিনি বিখ্যাত বৌদ্ধপণ্ডিত মণ্ডলীকে বিচারে পরাস্ত করিয়াছিলেন। এই প্রকারে দক্ষিণ দেশের সমস্ত প্রদেশ পরাজয় করিয়া পশ্চিমোত্তর প্রদেশ জয় করিবার জন্য যাত্রা করিলেন এবং বিন্ধ্য পর্ব্বত পার হইয়া বারাণসী নগরে উপস্থিত হইলেন। তথায় বিবিধ দর্শনশাস্ত্রপ্রণেতা সুপ্রসিদ্ধ নন্দনমিশ্রের সহিত বিচার করিয়া পরাজয় করিলেন। এইপ্রকারে তিনি কাশ্মীর

বল্লভীপুর প্রভৃতি উত্তর ও পশ্চিম দেশীয় সমস্ত প্রদেশে জয় লাভ করিয়া কর্ণাট দেশে প্রত্যাগমন করেন। পুনরায় দক্ষিণ দেশের সকল স্থানে ভ্রমণ ও বহুতর কীর্ত্তি স্থাপন করিয়া তথা হইতে উত্তর ও পূর্ব্বদেশে যাত্রা করিয়া নেপাল, কামরূপ প্রভৃতি দেশে গমন করতঃ পণ্ডিতবর্গকে পরাজয় করেন। পরিশেষে কাশ্মীর রাজ্যে গমন করিয়া স্বরস্বতীপীঠে কিয়ৎকাল অবস্থিতি করেন এবং কেদারনাথে দ্বাত্রিংশ বৎসর বয়ঃক্রম কালে মানব লীলা সম্বরণ করেন। কেহ কেহ বলেন, তিনি যবন দেশে যাত্রা করেন, তথা হইতে আর প্রত্যাগত হয়েন নাই। কোন্ সময়ে কোন্ স্থানে যে তাঁহার মৃত্যু হইয়াছিল, তাহা কেহ জ্ঞাত নহে। যাহা হউক ৩২ বৎসর বয়ঃক্রমের পর কেহ আর তাঁহাকে ভারতবর্ষে দর্শন করেন নাই।

এই অল্পকাল মধ্যে তিনি নানা শাস্ত্রে পারদর্শী হইয়াছিলেন, ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র পরিভ্রমণ এবং সর্ব্ব দেশের পণ্ডিতমণ্ডলীকে পরাজয় ও তত্তৎদেশ প্রচলিত মত সকল খণ্ডন করিয়া নিজ আবিষ্কৃত অদ্বৈতবাদ স্থাপন করিয়াছিলেন; স্থানে স্থানে মঠ স্থাপন করিয়া বেদান্তের চর্চ্চা বৃদ্ধি করিয়াছিলেন। দক্ষিণ দেশে শৃঙ্গী গিরিতে অদ্যাপি তাঁহার স্থাপিত একটী মঠ বিদ্যমান রহিয়াছে। অনেক স্থানে তিনি অনেক দেব দেবীর মূর্ত্তিও স্থাপন করিয়াছিলেন। অদ্বৈতবাদ মত স্থাপনই শঙ্করাচার্য্যের উদ্দেশ্য ছিল। কিন্তু তিনি বলিয়াছেন, যাহারা তাহাতে

অসমর্থ তাহারা শিবাদির উপাসনা করিতে পারে। দর্শন শাস্ত্রে শঙ্করাচার্য্য বিলক্ষণ পণ্ডিত ছিলেন। তিনি বেদান্তদর্শন প্রভৃতি অনেক গ্রন্থের উৎকৃষ্ট ভাষ্য প্রস্তুত করিয়াছিলেন। শঙ্করাচার্য্য এই দ্বাত্রিংশ বৎসর কালের মধ্যে বাল্যক্রীড়া, বিদ্যাশিক্ষা, সংসারপালন, সমগ্র ভারতবর্ষ পরিভ্রমণ ও তত্তৎদেশীয় সমস্ত পণ্ডিত বর্গকে বিচারে পরাজয় করেন ; বৌদ্ধ ধর্ম্মের করাল গ্রাস হইতে ভারতবর্ষকে উদ্ধার করিয়া আর্য্যগণের প্রাচীন কীর্ত্তি সকল দৃঢ় করেন। তদ্ভিন্ন কয়েকখানি উৎকৃষ্ট গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া জগতে চিরস্মরণীয় হইয়া গিয়াছেন। না জানি তিনি দীর্ঘজীবী হইলে কি করিতেন। শঙ্করাচার্য্য জন্মগ্রহণ না করিলে এত দিন হিন্দু ধর্ম্মের চিহ্নও থাকিত কি না সন্দেহ। শঙ্করবিজয় ও শঙ্করপ্রাদুর্ভাব গ্রন্থে তাঁহার অনেক বিবরণ সঙ্কলিত আছে।

কুমার বিজয়সিংহ।

প্রায় ২৪ শত বৎসর অতীত হইল, রাজকুমার বিজয়সিংহ বঙ্গদেশের অন্তর্গত সিংহপুর নামক নগরে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম মহারাজ সিংহ-বাহু ও মাতার নাম সিংহবল্লী। বিজয় সিংহের বাল্য-কালের কোন বৃত্তান্ত প্রাপ্ত হওয়া যায় না। যৌবন কালে তাঁহার পিতার সহিত তাঁহার বিবাদ হয়, তন্নিমিত্ত সিংহ

বাহু ক্রোধপরবশ হইয়া তাঁহার নির্ব্বাসনরূপ দণ্ড বিধান করেন। বিজয়সিংহ পিতাকর্ত্তৃক এইরূপে নির্ব্বাসিত হইয়া প্রায় পঞ্চশত সহচর সমভিব্যাহারে স্বদেশের নিকট জন্মের মত বিদায় লইয়া পোতারোহণ করিলেন। একপোতে তিনি ও তাঁহার সহচরেরা এবং অপর এক-পোতে তাহাদিগের স্ত্রীগণ ছিল। পথিমধ্যে এক প্রবল ঝটিকা উপস্থিত হওয়াতে স্ত্রীদিগের পোত নিরুদ্দেশ হইল ও পুরুষদিগের পোত সিংহলতটস্থ বালুকার উপর নিক্ষিপ্ত হইল। বিজয়সিংহ সমুদ্র-তরঙ্গ দ্বারা বলুকার উপর নিক্ষিপ্ত হওয়াতে কিয়ৎকাল মৃতপ্রায় হইয়া সেই বালুকার উপর শয়ান থাকেন। সিংহল-তটস্থ-বালুকা তাম্রবর্ণ। তাঁহার হস্ত ঐ বালুকার উপর নিপতিত থাকাতে তিনি তাম্রপাণি সংজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

বিজয়সিংহ সংজ্ঞা লাভানন্তর শ্রান্ত সহচরদিগকে প্রোৎসাহিত করিয়া সঙ্গে লইয়া দেশদর্শনার্থ গমন করিলেন। ঐ সময়ে যক্ষেরা সিংহল দ্বীপের অধিবাসী ছিল। তথাকার অধিপতি বিজয় সিংহকে সমাদরে গ্রহণ করিলেন এবং সভাসদ মধ্যে পরিগণিত করিয়া লইলেন। ক্রমে যক্ষরাজের সহিত রাজকুমারের সৌহার্দ্দ জন্মিল; যক্ষরাজ স্বীয় তনয়া কুবেণীর সহিত তাঁহার বিবাহ দিলেন। কিন্তু বিজয় সিংহ রাজার এইরূপ অনুগ্রহের উপযুক্ত কার্য্য করেন নাই। তিনি ষড়যন্ত্র করিয়া হঠাৎ কোন পর্ব্বোপলক্ষে রাজধানী আক্রমণ করিয়া তাহা অধিকার করেন। তিনি বিশ্বাস-

ঘাতকতা করিয়া যেমন লঙ্কার রাজ্যাধিকার করেন, সেই রূপ আর একটী অতি গর্হিত কার্য্য করিয়াছিলেন। রাজ্য লাভ করার কিছুদিন পরে তিনি কুবেণীকে অসভ্য রমণী জ্ঞান করিয়া আর একটী বিবাহ করিবার ইচ্ছা করেন। সেই উদ্দেশে ভারতবর্ষীয় কন্যা অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। দাক্ষিণাত্যের অন্তর্গত পাণ্ডুরাজ্যাধিপতি স্বীয় আত্মজার সহিত তাঁহার বিবাহ দিতে স্বীকৃত হইলে তিনি সেই কন্যাকে বিবাহ করেন। বিজয়সিংহ পরম সুন্দরী আর্য্যরমণী প্রাপ্ত হইয়া দুর্ভাগা কুবেণীকে দুইটী শিশুসন্তানের সহিত পরিত্যাগ করিলেন। ঐ অনাথা রমণী পতি কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইয়া দুঃখে ও অভিমানে বনমধ্যে প্রাণত্যাগ করেন। "সিংহলে এরূপ প্রবাদ এখনও প্রচলিত যে, কুবেণীর আত্মা কুবেণীগুল্লা পর্ব্বত শিখরে প্রতি রজনীতে আরোহণ করিয়া নিষ্ঠুর স্বরে স্বদেশের অমঙ্গল কামনা করিয়া অদ্যাপি তাহার উপায় সন্ধান করে।"

বিজয়সিংহ এইরূপ কয়েকটী অন্যায় কার্য্য করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার দ্বারা সিংহলের অনেক উন্নতি হইয়াছিল। তিনি সুপ্রশস্ত রাজমার্গ ও সুরম্য হর্ম্ম্যাদি নির্ম্মাণ করিয়া সিংহল দ্বীপকে সুশোভিত ও ব্যবস্থা প্রণয়ন প্রভৃতি কার্য্য করিয়া রাজকার্য্যের সুপ্রণালী প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। তাঁহার সিংহ উপাধি হইতে লঙ্কার সিংহল নাম হয় এবং তাঁহার তাম্রপাণি নাম হইতে উহার তাম্রপাণি নাম হয়। এইজন্য রোমীয়েরা ঐ শব্দের

অপভ্রংশ করিয়া সিংহল দ্বীপকে 'তাপ্রবেন' বলিত। বিজয়সিংহের পর ইংরেজ ভিন্ন অপর কোন জাতিই সিংহলদ্বীপ অধিকার করিতে পারে নাই।

বঙ্গদেশীয় রাজকুমার বিজয়সিংহের জীবনের অতি অল্পমাত্র ঘটনা জানা গিয়াছে। ইহাই আমাদিগের যথেষ্ট। ইহা দ্বারা জীবন চরিত পাঠের সম্যক্ ফল লাভ না হইলেও অন্ততঃ ইহা জানিতে পারা যায় যে, বাঙ্গালীদিগের বাহুবল ছিল, তাঁহারা সমুদ্র যাত্রা করিতেন, এবং বিদেশীয় রাজ্য অধিকার করিয়া তথায় আপনাদিগের আধিপত্য বিস্তার করিতেন। এই মহাত্মার জীবন চরিত পাঠে ইহাও নিঃসংশয়ে প্রতিপন্ন হইবে যে, বাঙ্গালী জাতি ভারতশাসনকর্ত্তা ইংরেজ জাতি অপেক্ষা আধুনিক নহেন।

সম্পূর্ণ।